এ রচনায় কমরেড মাও সেতুঙের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ধৃতি

“কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতে সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন যে অত অল্প সাফল্য অর্জন করেছিল তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সফল হতে পারেনা। আমাদের বিপ্লবে আমরা নিশ্চিতভাবে সাফল্য অর্জন করব এবং জনগণকে ভ্রান্ত পথে চালিত করবনা এটা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বন্ধুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা আর বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে”

“সংক্ষেপে, এটা সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, দালাল পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় জমিদার শ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হল আমাদের শত্রু। শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় শক্তি। সমস্ত আধাসর্বহারা ও ছোট বুর্শোয়া আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্শোয়াশ্রেণীর ডানপন্থীরা আমাদের শত্রু হতে পারে এবং বামপন্থীরা আমাদের মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে আর তাদেরকে আমাদের ফ্রন্টের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে দেওয়া চলবেনা”

মাও সেতুঙ

চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ

মাও সেতুঙ

মাও সেতুঙ। চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ। রচনা ও প্রকাশ মার্চ, ১৯২৬। কমরেড মাও সেতুঙ তৎকালীন পার্টির ভেতরের দু'টি বিচ্যুতির বিরোধিতা করার জন্য এই প্রবন্ধটি লেখেন। সেকালে পার্টির ভেতরকার প্রথম বিচ্যুতির প্রতিনিধিত্ব করত চেন তুসিউ, তারা কেবলমাত্র গণ জাতীয় পার্টি (কুওমিনতাঙ)-এর সাথে সহযোগিতা করার দিকেই মনোযোগ দিয়েছিল, কৃষকদের কথা ভুলে গিয়েছিল, এটা ছিল ডানপন্থী সুবিধাবাদ। দ্বিতীয় বিচ্যুতির প্রতিনিধিত্ব করত চাং কুও-তাও, তারা কেবলমাত্র শ্রমিক আন্দোলনের উপরই মনোযোগ দিয়েছিল আর তারাও কৃষকদের কথা ভুলে গিয়েছিল, এটা ছিল "বামপন্থী" সুবিধাবাদ। উভয় সুবিধাবাদই নিজেদের শক্তির অপর্যাপ্ততা জানত। কিন্তু উভয়ের কেউই জানতনা কোথায় সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত শক্তির সন্ধান করা যায় অথবা কোথায় ব্যাপকভাবে মিত্র পাওয়া যায়। কমরেড মাও সেতুঙ দেখিয়েছিলেন যে কৃষকরাই হচ্ছে চীনের সর্বহারাশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সংখ্যার দিকে দিয়ে বৃহত্তম মিত্র। এভাবে তিনি চীনা বিপ্লবের প্রধান মিত্র কে এই প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন। অধিকন্তু কমরেড মাও সেতুঙ লক্ষ্য করেছিলেন যে জাতীয় বুর্শোয়া শ্রেণী একটি দোদুল্যমান শ্রেণী এবং ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে বিপ্লবের উত্তাল জোয়ারে তা বিভক্ত হয়ে পড়বে আর এর দক্ষিণপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে যাবে। ১৯২৭ সালের ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়।

মাও সেতুঙ নির্বাচিত রচনাবলীর ১ম খণ্ডে রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে চীনের পিকিং গণ প্রকাশন কর্তৃক চীনা ভাষায় প্রকাশিত "মাও সেতুঙ রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণ থেকে বিদেশী ভাষা প্রকাশনা পিকিং বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশ করে। উক্ত ভাষান্তরে সামান্য কিছু ভাষাগত সম্পাদনা করে বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীর কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ ২৩শে জুন, ২০২৩ প্রকাশ করে। সর্বহারা পথ ওয়েবসাইট থেকে এই সংস্করণটির অধ্যয়ন ও প্রিন্ট নেয়া যাবে। মার্কস টু মাও ডট কম ও মার্কসিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভে সংরক্ষিত ইংরেজী কপির সাথেও বাংলা ভাষান্তর মিলিয়ে দেখা হয়েছে।।

বেকার হস্তশিল্পী ও অন্যান্য ভ্রষ্ট সর্বহারাগণ। সামন্ততান্ত্রিক চীনে প্রায়শই ধর্ম ও কুসংস্কারের সূত্রে এই সব লোক একত্রিত হত এবং পিতৃপ্রধান ধরণের বিভিন্ন নামের সংগঠন গড়ে তুলত, তাদের কারো কারো বা অস্ত্রশস্ত্রও ছিল। এই সব সংগঠনের মাধ্যমে তারা সামাজিক জীবনে ও অর্থনৈতিকভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে চাইত এবং তাদেরকে অত্যাচারকারী আমলা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনো কখনো এগুলিকে ব্যবহার করত। অবশ্য এই ধরণের পশ্চাদপদ সংগঠন কৃষক ও হস্তশিল্পীদের কোন পথ দেখাতে পারতনা। তার উপর এই ধরণের পশ্চাদপদ সংগঠন অতি সহজেই জমিদার ও স্থানীয় নিপীড়কদের দ্বারা নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হত, আর এছাড়া তাদের অন্ধ ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির কারণে কোন কোনটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হত। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাইশেকের প্রতিবিপ্লবী ক্যুদেতার সময়ে সে মেহনতী জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে ও বিপ্লবকে ধ্বংস করতে হিসেবে এদেরকে ব্যবহার করেছিল। আধুনিক শিল্প সর্বহারা শ্রেণী যখন জেগে উঠল আর তাদের শক্তি বিপুলভাবে বেড়ে গেল, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকরা ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাই এইসব আদিম ও পশ্চাদপদ সংগঠনের অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন থাকেনি)। এই সমস্ত লোককে কি করে পরিচালিত করা যায় সেটাই হচ্ছে চীনের অন্যতম কঠিন সমস্যা। সাহসী যোদ্ধা কিন্তু ধ্বংসাত্মক ঝোঁক সম্পন্ন এই লোকেরা যথার্থ নেতৃত্ব পেলে একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

সংক্ষেপে, এটা সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, দালাল পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় জমিদার শ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হল আমাদের শত্রু। শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় শক্তি। সমস্ত আধাসর্বহারা ও ছোট বুর্শোয়া আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্শোয়াশ্রেণীর ডানপন্থীরা আমাদের শত্রু হতে পারে এবং বামপন্থীরা আমাদের মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে আর তাদেরকে আমাদের ফ্রন্টের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে দেওয়া চলবেনা।।

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করার পর চীনের সাম্যবাদী পার্টির কাজ ছিল চীনের বাস্তবতায় তা প্রয়োগ করা। অগ্রবর্তী নেতা হিসেবে মাও সেতুঙের উপরই এ দায়িত্ব এসে পড়ে। তিনি মার্কসীয় দর্শনকে চীনের সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণে প্রয়োগ করলেন, যাতে চীন বিপ্লবের কর্মসূচি গড়ে তোলা যায়। আর সত্যিই তারা একধাপ এগিয়ে গেলেন যখন তারা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে চীন বিপ্লবের শত্রুমিত্র নির্ধারণ করলেন। নির্ধারণ করলেন কোন শ্রেণী বিপ্লবের নেতা। এই শ্রেণী কোন কোন শ্রেণীকে নিজের পক্ষে টেনে আনবে কোন কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মাও বলেনঃ

"কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতে সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন যে অত অল্প সাফল্য অর্জন করেছিল তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সফল হতে পারেনা। আমাদের বিপ্লবে আমরা নিশ্চিতভাবে সাফল্য অর্জন করব এবং জনগণকে ভ্রান্ত পথে চালিত করবনা এটা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বন্ধুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা আর বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে"।

আসুন আমরা সংক্ষেপে দেখি চীনের শ্রেণীসমূহঃ

জমিদার শ্রেণী ও দালাল বুর্শোয়া শ্রেণী। সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্যবাদের দালাল। চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ ও সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে আর চীনের উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

এরা এক চরম প্রতিবিপ্লবী চক্র। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রবাদী ও গণ জাতীয় পার্টি (কুওমিনতাঙ)-এর ডানপন্থী গোষ্ঠী হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

মাঝারি বুর্শোয়া শ্রেণী। এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্শোয়া শ্রেণী বলতে প্রধানতঃ জাতীয় বুর্শোয়া শ্রেণীকেই বোঝায়। চীনা বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তনশীল। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে ও যুদ্ধবাজদের অত্যাচারে নিদারুণ পীড়ণ ভোগ করে, তখন তারা বিপ্লবের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে, কিন্তু যখনই তারা অনুভব করে যে, বিপ্লবে স্বদেশে সর্বহারা শ্রেণীর জঙ্গি অংশগ্রহণ আর বিদেশে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন তাদের বড় বুর্শোয়া শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবার আশা আকাঙ্খাকে বিপদাপন্ন করছে, তখনই তারা বিপ্লবের প্রতি সন্ধিহান হয়ে উঠে। একটি মাত্র শ্রেণী অর্থাৎ জাতীয় বুর্শোয়া শ্রেণীর শাসনাধীনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ছোট বুর্শোয়া শ্রেণী। সংখ্যা ও চরিত্রের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মালিক কৃষক অর্থাৎ মাঝারি কৃষক, মালিক হস্তশিল্পী, নিচের স্তরের বুদ্ধিজীবি—ছাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, ছোটখাট সরকারী কর্মচারী, দপ্তরের কেরাণি, ছোট উকিল--, এবং ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পড়ে তারা, যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও শস্য আছে অর্থাৎ দৈহিক অথবা মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় বা উপার্জন করে। এই ধরণের ব্যক্তিরা ধনী হবার জন্য একান্ত উদ্গ্রীব ও লালায়িত। বিপ্লবের বিষয়ে তারা সন্দিহান। এই অংশটি ছোট বুর্শোয়াদের মধ্যে সংখ্যালঘু এবং ছোট বুর্শোয়াদের ডানপন্থী।

দ্বিতীয় অংশটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটের উপর আত্মনির্ভরশীল। এই অংশের লোকেরা প্রথম অংশের লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন। এরাও

সেই কারণে তারা ভাল যোদ্ধা। শক্তি হিসেবে শহরের কুলিরাও গভীর মনোযোগ পাবার অধিকারী। তাদের বেশির ভাগই বন্দরের মুটে মজুর ও রিকশাঅলা। মেথর, ময়লাগাড়ীর চালক ও রাস্তা পরিষ্কারকারী ঝাড়ুদারও তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের হাত ছাড়া তাদের জন্য কোন সম্বল না থাকায় তাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মতই। কিন্তু শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চেয়ে তারা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদনে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষিকার্য এখনো খুবই কম। গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাশ্রেণী বলতে আমরা বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক মেয়াদে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদেরই বুঝি। এই ক্ষেতমজুরদের কাছে জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, এমনকি কোন অর্থও না থাকায় তারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে পারে। অন্য সব শ্রমিকের তুলনায় তাদের কাজের সময় দীর্ঘতম, বেতন সবচেয়ে কম, শ্রমের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় আর চাকুরির নিরাপত্তা সবচেয়ে কম। গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের লেকেরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছে এবং কৃষক আন্দোলনে তাদের অবস্থান গরীব কৃষকদের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া রয়েছে সংখ্যায় বেশ বড় ভ্রষ্ট সর্বহারা যারা ভূমিহীন কৃষকদের এবং কাজ পায়না এমন হস্তশিল্প কারিগরদের নিয়ে গঠিত শ্রেণী। তাদের অস্তিত্বই হচ্ছে সব চাইতে অনিশ্চিত। দেশের সব স্থানেই তাদের গোপন সংগঠন রয়েছে। আগে এগুলি ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য পারস্পরিক সাহায্য সংগঠন, যেমন ফুচিয়ান ও কুয়াংতোংয়ে "ত্রয়ী সমিতি", হুনান, হুপেই, কৌয়েইচৌ ও সিচুয়ানে "ভ্রাতৃত্ব সমিতি", আনহুই, হোনান ও শানতুংয়ে "বড় তরবারি সমিতি", চিলি *(টীকাঃ চিলি হচ্ছে হোপেই প্রদেশের পুরনো নাম)* ও তিনটি উত্তরপূর্ব প্রদেশে "যৌক্তিক জীবন সমিতি" এবং সাংহাই ও অন্যান্য স্থানে "সবুজ গোষ্ঠী" *[টীকাঃ "ত্রয়ী সমিতি" (সানহোহুই"), "সহোদর সমিতি" (কোলাওহুই), "বড় তরবারী সমিতি" ("তাতাওহুই") এবং "সবুজ গোষ্ঠী" ("চিংপাং") ছিল জনসাধারণের মধ্যে আদিম ধরণের গুপ্ত সংগঠন। এই সংগঠনে প্রধানতঃ ছিল দেউলিয়া কৃষক,*

প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়। এইভাবে উভয় খনিই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণদখলে এসে যায়। খাইলুয়ান ধর্মঘট ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয়। চিয়াউৎসুও কয়লা খনি উত্তর হুনান প্রদেশে অবস্থিত এবং সেসময়ে এই খনিও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। চিয়াউৎসুও ধর্মঘট ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে ঘটেছিল। ৩০শে মে আন্দোলনের সমর্থনে এই ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সাত মাসের অধিক সময় ধরে তা স্থায়ী ছিল), শামিয়ে ধর্মঘট *(টীকাঃ সেসময়ে শামিয়ে ছিল কুয়াংচৌ শহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দখল করা একটি এলাকা। শামিয়ে শাসনকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে এক নতুন পুলিশ আইন জারি করে যার অধীনে ঐ দখলকৃত এলাকা থেকে আসা যাওয়ার সময় সমস্ত চীনাদের নিজের ফটোযুক্ত পাশ দেখাতে হত, কিন্তু বিদেশীরা সেখানে স্বাধীনভাবে আসাযাওয়া করতে পারত। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৫ই জুলাই তারিখে শামিয়ের শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে। ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়)* এবং ৩০শে মে'র আন্দোলনের পর সাংহাই ও হংকংয়ের সাধারণ ধর্মঘট *(সাংহাইয়ের ১৯২৫ সালের ৩০শে মে'র ঘটনার পর, ১লা জুন তারিখে সাংহাইয়ে ও ১৯শে জুন হংকংয়ে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। সাংহাইয়ে দুই লক্ষ আর হংকংয়ে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করে। সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন পেয়ে হংকংয়ের বিরাট ধর্মঘট ১৬ মাস ধরে চলে। বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম ধর্মঘট ছিল)* প্রভৃতি ধর্মঘটে তারা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তার থেকেই আমরা চীন বিপ্লবে শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারা শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে দেখতে পারি। তাদের এই অবস্থানের প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে তারা কেন্দ্রীভূত। জনসাধারণের অন্য কোন অংশের লোকই তাদের মত এত কেন্দ্রীভূত নয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাদের নিম্নমানের অর্থনৈতিক অবস্থা। উৎপাদনের সব উপায় হতে তারা বঞ্চিত, নিজেদের হাত ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, ধনী হবার কোন আশা তাদের নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বুর্শোয়া শ্রেণী তাদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে।

ধনী হতে ইচ্ছুক, কিন্তু কোন মতেই তারা ধনী হতে পারেনা। তার উপর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শোষকদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে তারা জেনেছে যে, এখন পৃথিবী আর আগের মত নেই। তারা অনুভব করে যে আগের মত সমান পরিশ্রম করলেও আজ আর বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবেনা। আয়ব্যয় মেলাতে তাদের আরো বেশি সময় কাজ করতে হবে, আরো সকালে উঠতে হবে, আরো দেরিতে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে আর কাজে দ্বিগুণ সতর্ক হতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করে আর নিরপেক্ষ থাকতে পছন্দ করে, কিন্ত তারা কখনো বিপ্লবের বিরোধিতা করেনা। এই অংশে অন্তর্ভুক্তদের সংখ্যা খুব বেশি। তারা ছোট বুর্শোয়াদের প্রায় অর্ধেক।

যারা তৃতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত, তাদের জীবিকার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতি বছরই তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, তাদের ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হচ্ছে, তাই তারা "ভবিষ্যতের চিন্তা করে আঁতকে উঠে"। তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্য আছে বলে তাদের মনোকষ্ট। এই ধরণের লোকেরা বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তারা সংখ্যার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য আর তারাই হচ্ছে ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থী অংশ।

স্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি এই তিনটি অংশের মনোভাব বিভিন্ন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ বিপ্লবে যখন জোয়ার আসে আর বিজয়ের সূর্য যখন উদীয়মান, তখন ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থী অংশই শুধু নয়, মধ্যপন্থীরাও বিপ্লবে যোগদান করতে পারে, এবং সর্বহারা শ্রেণী ও ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্লবিক জোয়ারে ভেসে গিয়ে এমনকি ডানপন্থীরাও বিপ্লবের সাথে যেতে বাধ্য হয়।

আধাসর্বহারা। এই শ্রেণীটি পাঁচটি উপশ্রেণীতে বিভক্তঃ ১। আধা মালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ অর্থাৎ সেই দরিদ্র কৃষক যারা অংশত নিজেদের জমিতে চাষ করে এবং অংশত অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া জমিতে চাষ করে, ২। গরীব কৃষক ৩। ছোট হস্তশিল্পী ৪। দোকান কর্মচারী ৫। ফেরিঅলা।

আধামালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ও গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামের জনগণের এক বিরাট অংশ। কৃষক সমস্যা প্রধানত তাদেরই সমস্যা। আধামালিক কৃষক, গরীব কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পীরা মালিক কৃষক ও মালিক হস্তশিল্পীদের চেয়ে আরো ছোট আকারের উৎপাদনে নিযুক্ত। আধা মালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ও গরীব কৃষক উভয়ই যদিও আধা সর্বহারা শ্রেণীর অংশভুক্ত, তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন এই তিনটি ভাগ করা যেতে পারে।

আধামালিক কৃষকদের অবস্থা মালিক কৃষকদের চেয়ে খারাপ যাদের অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু গরীব কৃষকদের চেয়ে ভাল। কারণ গরীব কৃষকদের নিজস্ব কোন জমি নেই, সারা বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তার শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়, কিন্তু আধা মালিক কৃষকেরা অন্যের নিকট হতে বর্গা নেয়া জমির ফসলের অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম পেলেও নিজেদের জমির সমস্ত ফসলেরই মালিক। সুতরাং আধা মালিক কৃষকেরা মালিক কৃষকদের চেয়ে বেশি বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকদের চেয়ে কম বিপ্লবী।

গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের প্রজাচাষী এবং জমিদারদের দ্বারা শোষিত। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে এই উপশ্রেণীকেও আবার দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। এক অংশের তুলনামূলক পর্যাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি আর কিছু অর্থ আছে। এই ধরণের কৃষকরা তাদের বাৎসরিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা রাখতে পারে। অভাব পূরণের জন্য তারা পার্শ্ব শস্য উৎপাদন করে, মাছ বা চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শূকর পোষে অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা দুঃখকষ্ট অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশা পোষণ করে। তাই, তাদের অবস্থা আধামালিক কৃষকদের চেয়ে খারাপ কিন্তু গরীব কৃষকের অন্য অংশের চেয়ে সচ্ছল। তারা আধামালিক কৃষকদের চেয়ে বেশি বিপ্লবী কিন্তু গরীব কৃষকদের অন্য অংশের চেয়ে কম বিপ্লবী। গরীব কৃষকদের অন্য অংশের কথা বলতে গেলে তাদের না আছে পর্যাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি

এই বিশ লক্ষ শিল্প শ্রমিক প্রধানতঃ পাঁচটি শিল্পে নিযুক্ত—রেলওয়ে, খনি, নৌপরিবহন, বস্ত্রশিল্প এবং জাহাজ নির্মাণ। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ। সংখ্যায় বেশি না হলেও, এরাই চীনের নতুন উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, আধুনিক চীনে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি। বিগত চার বছরের নাবিক ধর্মঘট *(টীকাঃ ১৯২২ সালের প্রারম্ভে হংকং ও ইয়াংসির জাহাজের নাবিকগণ ধর্মঘট করে। হংকংয়ের নাবিকরা দৃঢ়তার সাথে আট সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট চালায়। তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রামের পরে শেষ পর্যন্ত হংকংয়ের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়নের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, বন্দী শ্রমিকদের মুক্তি ও শহীদ পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এর অল্পকাল পরেই ইয়াংসির জাহাজের নাবিক ও শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে দেয় এবং দু'সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মঘট চালানোর পর তারাও বিজয় লাভ করে)*, রেলওয়ে ধর্মঘট *(১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই চীনা সাম্যবাদী পার্টি রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চালাতে শুরু করে। ১৯২২-২৩ সালে সাম্যবাদী পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত প্রধান প্রধান রেলপথে ধর্মঘট হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল পিকিং-হ্যাংকাও রেলওয়ের সাধারণ ধর্মঘট, যা ১৯২৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার স্বাধীনতার জন্য চালিয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সমর্থিত উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ উ পেইফু ও সিয়াও ইয়াওনান ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এটাই ইতিহাসে "৭ই ফেব্রুয়ারী হত্যাকাণ্ড" নামে পরিচিত)*, খাইলুয়ান ও চিয়াউৎসুও কয়লা খনির ধর্মঘট *(খাইলুয়ান কয়লা খনি হচ্ছে হোপেই প্রদেশে অবস্থিত পরস্পর সংলগ্ন বিশাল খাইপিং ও লুয়ানচৌ কয়লা খনি দুটির সাধারণ নাম। সেই সময়ে সেখানে ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ করত। ১৯০০ সালে "ইহোথুয়ান" আন্দোলনের সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা খাইপিং কয়লা খনি কেড়ে নিয়েছিল। পরে চীনারা লুয়ানচৌ কয়লা খনি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে, কিছুকাল পর এই কোম্পানী খাইলুয়ান কয়লা খনি*

দুঃসময়ে তারা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট করুণভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে, কয়েক ধরা বা কয়েক সের শস্য ধার করে কোনক্রমে দুই চার দিন চলে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝা মত তাদের ঋণও স্তূপীকৃত হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার এবং তারা বিপ্লবী প্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ছোট হস্তশিল্পীদেরকে আধা সর্বহারাদের দলভুক্ত করা যায়, কারণ যদিও উৎপাদনের কিছু সরল উপকরণ তাদের আছে এবং তার উপর আত্মনিযুক্ত, তবুও তারা প্রায়ই আংশিকভাবে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়, এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের অবস্থা অনেকটা গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের মতই। তাদের পরিবার পালনের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিদ্রের জ্বালা ভোগ ও বেকারত্বের আশংকার মধ্যে থাকার দরুন গরীব কৃষকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল আছে। দোকান কর্মচারী হচ্ছে দোকানের বেতনভুক্ত কর্মী, নিজদের সামান্য বেতন দিয়ে পরিবার পরিজনদের খরচ চালাতে হয় তাদের। প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও, তাদের বেতন হয়ত বহু বছরে একবার মাত্র বাড়ে। সুযোগ মত তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেই, তারা হৃদয় উজাড় করে তাদের অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বলে যায়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটিভাবে গরীব কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পীদের একই পর্যায়ভুক্ত। বিপ্লবী প্রচারকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে। পণ্যদ্রব্য লাঠিতে ঝুলিয়ে বয়েই ফিরি করুক কিংবা রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রী করুক, ফেরিঅলাদের মূলধন কিন্তু অল্প আর উপার্জনও খুবই কম। এতে তাদের খাওয়া পরার খরচ কুলায়না। তাদের অবস্থা মোটামুটিভাবে গরীব কৃষকদের একই পর্যায়ভুক্ত। তাই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য গরীব কৃষকদের মত তাদেরও বিপ্লবের প্রয়োজন।

সর্বহারা শ্রেণী। আধুনিক শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারার সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন পশ্চাদপদ দেশ বলে সর্বহারার সংখ্যা বেশি নয়। পৃ ১৮

না আছে অর্থ, আর না আছে যথেষ্ট সার, তাদের উৎপাদিত ফসল খুবই কম আর খাজনা দেয়ার পর তাদের কাছে প্রায় কিছুই থাকেনা, সুতরাং তাদের আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করার প্রয়োজন আরো বেশি। দুঃসময়ে তারা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট করুণভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে, কয়েক ধরা বা কয়েক সের শস্য ধার করে কোনক্রমে দুই চার দিন চলে, এইভাবে ষাঁড়ের পিঠের বোঝা মত তাদের ঋণও স্তূপীকৃত হতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার এবং তারা বিপ্লবী প্রচারকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। ছোট হস্তশিল্পীদেরকে আধা সর্বহারাদের দলভুক্ত করা যায়, কারণ যদিও উৎপাদনের কিছু সরল উপকরণ তাদের আছে এবং তার উপর আত্মনিযুক্ত, তবুও তারা প্রায়ই আংশিকভাবে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়, এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের অবস্থা অনেকটা গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষকদের মতই। তাদের পরিবার পালনের ভারি বোঝা, উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ের ব্যবধান এবং প্রতিনিয়ত দারিদ্রের জ্বালা ভোগ ও বেকারত্বের আশংকার মধ্যে থাকার দরুন গরীব কৃষকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল আছে। দোকান কর্মচারী হচ্ছে দোকানের বেতনভুক্ত কর্মী, নিজদের সামান্য বেতন দিয়ে পরিবার পরিজনদের খরচ চালাতে হয় তাদের। প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও, তাদের বেতন হয়ত বহু বছরে একবার মাত্র বাড়ে। সুযোগ মত তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেই, তারা হৃদয় উজাড় করে তাদের অন্তহীন দুঃখ দুর্দশার কাহিনী বলে যায়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটিভাবে গরীব কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পীদের একই পর্যায়ভুক্ত। বিপ্লবী প্রচারকে তারা অতি সহজেই গ্রহণ করে। পণ্যদ্রব্য লাঠিতে ঝুলিয়ে বয়েই ফিরি করুক কিংবা রাস্তার পাশে ছোট দোকান খুলেই বিক্রী করুক, ফেরিঅলাদের মূলধন কিন্তু অল্প আর উপার্জনও খুবই কম। এতে তাদের খাওয়া পরার খরচ কুলায়না। তাদের অবস্থা মোটামুটিভাবে গরীব কৃষকদের একই পর্যায়ভুক্ত। তাই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য গরীব কৃষকদের মত তাদেরও বিপ্লবের প্রয়োজন। পৃ ৭

সর্বহারা শ্রেণী। আধুনিক শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারার সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন পশ্চাদপদ দেশ বলে সর্বহারার সংখ্যা বেশি নয়। এই বিশ লক্ষ শিল্প শ্রমিক প্রধানতঃ পাঁচটি শিল্পে নিযুক্ত—রেলওয়ে, খনি, নৌপরিবহন, বস্ত্রশিল্প এবং জাহাজ নির্মাণ। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বিদেশী পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ। সংখ্যায় বেশি না হলেও, এরাই চীনের নতুন উৎপাদন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, আধুনিক চীনে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বকারী শক্তি। তাদের এই অবস্থানের প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে তারা কেন্দ্রীভূত। জনসাধারণের অন্য কোন অংশের লোকই তাদের মত এত কেন্দ্রীভূত নয়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাদের নিম্নমানের অর্থনৈতিক অবস্থা। উৎপাদনের সব উপায় হতে তারা বঞ্চিত, নিজেদের হাত ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, ধনী হবার কোন আশা তাদের নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ ও বুর্শোয়া শ্রেণী তাদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। সেই কারণে তারা ভাল যোদ্ধা। শক্তি হিসেবে শহরের কুলিরাও গভীর মনোযোগ পাবার অধিকারী। তাদের বেশির ভাগই বন্দরের মুটে মজুর ও রিকশাঅলা। মেথর, ময়লাগাড়ীর চালক ও রাস্তা পরিষ্কারকারী ঝাড়ুদারও তাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের হাত ছাড়া তাদের জন্য কোন সম্বল না থাকায় তাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মতই। কিন্তু শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের চেয়ে তারা কম কেন্দ্রীভূত এবং উৎপাদনে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চীনে আধুনিক পুঁজিবাদী কৃষিকার্য এখনো খুবই কম। গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাশ্রেণী বলতে আমরা বার্ষিক, মাসিক অথবা দৈনিক মেয়াদে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদেরই বুঝি। এই ক্ষেতমজুরদের কাছে জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, এমনকি কোন অর্থও না থাকায় তারা শুধু নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে পারে। অন্য সব শ্রমিকের তুলনায় তাদের কাজের সময় দীর্ঘতম, বেতন সবচেয়ে কম, শ্রমের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় আর চাকুরির নিরাপত্তা সবচেয়ে কম। গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের লেকেরাই

করে দিতে অথবা ছোট ব্যবসায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। বসন্তের শেষে আর গ্রীষ্মের প্রথমে শস্য যখন কাঁচা থাকে এবং পুরোনো মজুদ শস্যও নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন তারা উচ্চ সুদে টাকা ধার করে আর চড়া দামে শস্য কেনে। তাদের অবস্থা স্বভাবতই মালিক কৃষকদের চেয়ে খারাপ যাদের অপরের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু গরীব কৃষকদের চেয়ে ভাল। কারণ গরীব কৃষকদের নিজস্ব কোন জমি নেই, সারা বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তার শুধু অর্ধেক অথবা অর্ধেকেরও কম ফসল পায়, কিন্তু আধা মালিক কৃষকেরা অন্যের নিকট হতে বর্গা নেয়া জমির ফসলের অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম পেলেও নিজেদের জমির সমস্ত ফসলেরই মালিক। সুতরাং আধা মালিক কৃষকেরা মালিক কৃষকদের চেয়ে বেশি বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকদের চেয়ে কম বিপ্লবী। গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের প্রজাচাষী এবং জমিদারদের দ্বারা শোষিত। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে এই উপশ্রেণীকেও আবার দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। এক অংশের তুলনামূলক পর্যাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি আর কিছু অর্থ আছে। এই ধরণের কৃষকরা তাদের বাৎসরিক শ্রমের ফলের অর্ধেকটা রাখতে পারে। অভাব পূরণের জন্য তারা পার্শ্ব শস্য উৎপাদন করে, মাছ বা চিংড়ি ধরে, মুরগী বা শূকর পোষে অথবা নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এইভাবে তারা দুঃখকষ্ট ও অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে বছরটা কাটিয়ে দেবার আশা পোষণ করে। অতএব, তাদের অবস্থা আধা মালিক কৃষকদের চেয়ে খারাপ, কিন্তু গরীব কৃষকের অন্য অংশের চেয় সচ্ছল। তারা আধা মালিক কৃষকদের চেয়ে বেশি বিপ্লবী, কিন্তু গরীব কৃষকদের অন্য অংশের চেয়ে কম বিপ্লবী। গরীব কৃষকদের অন্য অংশের কথা বলতে গেলে, তাদের না আছে পর্যাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতি, না আছে অর্থ, আর না আছে যথেষ্ট সার, তাদের উৎপাদিত ফসল খুবই কম আর খাজনা দেয়ার পর তাদের কাছে প্রায় কিছুই থাকেনা, তাই তাদের আংশিকভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করার প্রয়োজন আরো বেশি।

জমায়েত হয় এবং উচ্চ স্বরে "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" ও "সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়, ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়। এই ঘটনাই "৩০শে মে'র হত্যাকাণ্ড" বলে পরিচিত। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং শ্রমিক, ছাত্র ও দোকান কর্মচারীদের ধর্মঘট ও হরতাল শুরু হয়। এই ধর্মঘট ও হরতাল বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়) এবং বিভিন্ন স্থানের কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে এই সিদ্ধান্ত সঠিক।

আধাসর্বহারা। এই শ্রেণীটি পাঁচটি উপশ্রেণীতে বিভক্তঃ ১। আধা মালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ *(টীকাঃ আধা মালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ বলতে মাও এখানে সেই দরিদ্র কৃষকদের কথা বুঝিয়েছেন যারা অংশত নিজেদের জমিতে চাষ করে এবং অংশত অন্যদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া জমিতে চাষ করে)*, ২। গরীব কৃষক ৩। ছোট হস্তশিল্পী ৪। দোকান কর্মচারী *(টীকাঃ পুরোনো চীনে দোকান কর্মচারীরা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত ছিল। এখানে কমরেড মাও সেতুঙ এদের সংখ্যাগুরু স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আর একটি অংশ—নিম্নস্তরের দোকান কর্মচারীরা সর্বহারার জীবনযাপন করত)* ৫। ফেরিঅলা। আধামালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ও গরীব কৃষক হচ্ছে গ্রামের জনগণের এক বিরাট অংশ। কৃষক সমস্যা প্রধানত তাদেরই সমস্যা। আধামালিক কৃষক, গরীব কৃষক ও ছোট হস্তশিল্পীরা মালিক কৃষক ও মালিক হস্তশিল্পীদের চেয়ে আরো ছোট আকারের উৎপাদনে নিযুক্ত। আধা মালিক কৃষকদের বিপুল সংখ্যাধিক অংশ ও গরীব কৃষক উভয়ই যদিও আধা সর্বহারা শ্রেণীর অংশভুক্ত, তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন এই তিনটি ভাগ করা যেতে পারে। আধামালিক কৃষকদের অবস্থা মালিক কৃষকদের চেয়ে খারাপ, কারণ প্রতি বছরই তাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রায় অর্ধেক ঘাটতিতে পড়ে এবং এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য তারা অন্যের থেকে জমি বর্গা নিতে বাধ্য হয়, নিজেদের শ্রমশক্তি আংশিকভাবে বিক্রি পৃ১৬

সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছে এবং কৃষক আন্দোলনে তাদের অবস্থান গরীব কৃষকদের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া রয়েছে সংখ্যায় বেশ বড় ভ্রষ্ট সর্বহারা যারা ভূমিহীন কৃষকদের এবং কাজ পায়না এমন হস্তশিল্প কারিগরদের নিয়ে গঠিত শ্রেণী। তাদের অস্তিত্বই হচ্ছে সব চাইতে অনিশ্চিত। এই সমস্ত লোককে কি করে পরিচালিত করা যায় সেটাই হচ্ছে চীনের অন্যতম কঠিন সমস্যা কারণ প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়ার ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও অন্ধ ধ্বংসাত্মক চরিত্রের কারণে এরা প্রায়ই প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সাহসী যোদ্ধা কিন্তু ধ্বংসাত্মক ঝোঁক সম্পন্ন এই লোকেরা যথার্থ নেতৃত্ব পেলে একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

সবশেষে মাও সারসংক্ষেপ করেনঃ

"সংক্ষেপে, এটা সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, দালাল পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় জমিদার শ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হল আমাদের শত্রু। শিল্পকারখানায় কর্মরত সর্বহারাশ্রেণীই হল আমাদের বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় শক্তি। সমস্ত আধাসর্বহারা ও ছোট বুর্শোয়া আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্শোয়াশ্রেণীর ডানপন্থীরা আমাদের শত্রু হতে পারে এবং বামপন্থীরা আমাদের মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে আর তাদেরকে আমাদের ফ্রন্টের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে দেওয়া চলবেনা"।।

কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী

২৩শে জুন, ২০২৩

চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ

মার্চ, ১৯২৬

কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অতীতে সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন যে অত অল্প সাফল্য অর্জন করেছিল তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোন বিপ্লবই সফল হতে পারেনা। আমাদের বিপ্লবে আমরা নিশ্চিতভাবে সাফল্য অর্জন করব এবং জনগণকে ভ্রান্ত পথে চালিত করবনা এটা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বন্ধুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা আর বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কী রকম?

জমিদার শ্রেণী ও দালাল বুর্শোয়া শ্রেণী [দালাল শ্রেণী ছিল চীনের বিদেশী পুঁজির দালাল বুর্শোয়া শ্রেণী—বাংলা অনুবাদক]। তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ আধাউপনিবেশিক চীনে পুরোপুরিভাবেই আন্তর্জাতিক বুর্শোয়াদের লেজুড় আর নিজেদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই শ্রেণীগুলো চীনের সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ ও সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে আর চীনের উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। চীনা বিপ্লবের উদ্দেশ্যের সাথে তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। বিশেষ করে বড় জমিদার শ্রেণী ও বড় দালাল শ্রেণী তো সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করে আর তারা হচ্ছে একটি চরম প্রতিবিপ্লবী চক্র।

তারা যখন হিসেবনিকেশ করতে আসে, তখন আঁতকে উঠে বলে, "হায়! আবার ঘাটতি"। কারণ এ ধরনের লোকেরা অতীতে সুদিনের মধ্যে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু এখন প্রতি বছরই তাদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে, তাদের ঋণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনও শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হচ্ছে, তাই তারা "ভবিষ্যতের চিন্তা করে আঁতকে উঠে"। তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্য আছে বলে তাদের মনোকষ্ট। এই ধরণের লোকেরা বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তারা সংখ্যার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য আর তারাই হচ্ছে ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থী অংশ। স্বাভাবিক সময়ে বিপ্লবের প্রতি এই তিনটি অংশের মনোভাব বিভিন্ন। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অর্থাৎ বিপ্লবে যখন জোয়ার আসে আর বিজয়ের সূর্য যখন উদীয়মান, তখন ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থী অংশই শুধু নয়, মধ্যপন্থীরাও বিপ্লবে যোগদান করতে পারে, এবং সর্বহারা শ্রেণী ও ছোট বুর্শোয়াদের বামপন্থীদের বিরাট বৈপ্লবিক জোয়ারে ভেসে গিয়ে এমনকি ডানপন্থীরাও বিপ্লবের সাথে যেতে বাধ্য হয়। ১৯২৫ সালের ৩০শে মে'র আন্দোলন *(টীকাঃ ১৯২৫ সালের ৩০শে মে সাংহাইয়ে বৃটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে শিংতাও ও সাংহাইয়ে জাপানী সূতাকলগুলোতে একের পর এক ধর্মঘট হয় যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে সাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিকরা কু চেংহোঙ নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশজনেরও বেশি শ্রমিককে আহত করে। ২৮শে মে তারিখে শিংতাওয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আট জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে সাংহাইয়ে দুহাজারেরও অধিক ছাত্র বিদেশীদের অধীন এলাকাগুলিতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এই সব এলাকা পুনরুদ্ধারের আহবান জানায়। এর পরেই বৃটিশ অধীন এলাকার পুলিশ সদর দফতরের সম্মুখে দশ হাজারেরও অধিক লোক*

প্রচারে যথেষ্ট বিশ্বাসী আর বিপ্লবের বিষয়ে তারা সন্দিহান। এই অংশটি ছোট বুর্শোয়াদের মধ্যে সংখ্যালঘু এবং ছোট বুর্শোয়াদের ডানপন্থী। দ্বিতীয় অংশটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটের উপর আত্মনির্ভরশীল। এই অংশের লোকেরা প্রথম অংশের লোকদের থেকে অনেক ভিন্ন। এরাও ধনী হতে ইচ্ছুক, কিন্তু "মার্শাল চাও" কোন মতেই তাদের ধনী হতে দেয়না। তার উপর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, সামন্ত জমিদার ও বড় দালাল বুর্শোয়াদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে তারা জেনেছে যে, এখন পৃথিবী আর আগের মত নেই। তারা অনুভব করে যে আগের মত সমান পরিশ্রম করলেও আজ আর বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবেনা। আয়ব্যয় মেলাতে তাদের আরো বেশি সময় কাজ করতে হবে, আরো সকালে উঠতে হবে, আরো দেরিতে কর্মস্থল ত্যাগ করতে হবে আর কাজে দ্বিগুণ সতর্ক হতে হবে। তারা গালাগালি করতে আরম্ভ করে, বিদেশীদের "বিদেশী শয়তান", যুদ্ধবাজদের "দস্যু সর্দার" আর স্থানীয় নিপীড়ক ও ভদ্রবেশী বদমাসদের *(স্থানীয় নিপীড়ক ও ভদ্রবেশী বদমাসরা ছিল জমিদারশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যক্তি। ধনী কৃষকদের মধ্যেও ছোটখাট ধরণের স্থানীয় নিপীড়ক ও ভদ্রবেশী বদমাস ছিল)* "হৃদয়হীন ধনী" বলে নিন্দা করে। সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে তারা শুধু সন্দেহ করে যে, এটা সফল হবে কিনা (কারণ বিদেশী ও যুদ্ধবাজদের অতি শক্তিশালি বলে মনে হয়), এতে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করে আর নিরপেক্ষ থাকতে পছন্দ করে, কিন্ত তারা কখনো বিপ্লবের বিরোধিতা করেনা। এই অংশে অন্তর্ভুক্তদের সংখ্যা খুব বেশি। তারা ছোট বুর্শোয়াদের প্রায় অর্ধেক। যারা তৃতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত, তাদের জীবিকার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তাদের অনেকেই আগে হয়ত কোন অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ছিল, কিন্তু তাদের অবস্থা কোন মতে জীবনধারণ করা থেকে ক্রমাগত বেশি খারাপ অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করায় পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতি বছর শেষে

রাষ্ট্রবাদী *(টীকাঃ রাষ্ট্রবাদী হচ্ছে একদল মুষ্টিমেয় নির্লজ্জ ফ্যাসিবাদী রাজনীতিবিদ, যারা সেসময়ে "চীনের রাষ্ট্রবাদী যুবলীগ" গঠন করে, পরে এই সংগঠনের নাম "চীনের যুব পার্টি" রাখা হয়। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তারা সাম্যবাদী পার্টির এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করাটাকে নিজেদের প্রতিবিপ্লবী পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল)* ও গণ জাতীয় পার্টির ডানপন্থী গোষ্ঠী হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

মাঝারি বুর্শোয়া শ্রেণী। এই শ্রেণী চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝারি বুর্শোয়া শ্রেণী বলতে প্রধানতঃ জাতীয় বুর্শোয়া শ্রেণীকেই বোঝায়। চীনা বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তনশীল। যখন তারা বিদেশী পুঁজির আঘাতে ও যুদ্ধবাজদের অত্যাচারে নিদারুণ পীড়ণ ভোগ করে, তখন তারা বিপ্লবের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে, কিন্তু যখনই তারা অনুভব করে যে, বিপ্লবে স্বদেশে সর্বহারা শ্রেণীর জঙ্গি অংশগ্রহণ আর বিদেশে আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন তাদের বড় বুর্শোয়া শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবার আশা আকাঙ্খাকে বিপদাপন্ন করছে, তখনই তারা বিপ্লবের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠে। একটি মাত্র শ্রেণী অর্থাৎ জাতীয় বুর্শোয়া শ্রেণীর শাসনাধীনে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। তাই চী তাওয়ের *(টীকাঃ তাই চিতাও যুবাবস্থাতেই গণ জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিল আর চিয়াং কাইশেকের অংশীদার হয়ে শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজি করত। ১৯২৫ সালে সান ইয়াতসেনের মৃত্যুর পর, সে সাম্যবাদবিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হয় এবং ১৯২৭ সালে চিয়াং কাইশেকের প্রতিবিপ্লবী কু'দেতার মতাদর্শগত ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী কাজে সে ছিল চিয়াংক কাইশেকের পদলেহী কুকুর। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চিয়াং কাইশেকের শাসনের ধ্বংসের অপরিহার্যতা দেখে হতাশ হয়ে সে আত্মহত্যা করে)* "খাঁটি শিষ্য" বলে পরিচিত জনৈক ব্যক্তি পিকিংয়ের "চেন পাও"

(টীকাঃ পিকিং "চেন পাও" সেই সময়ে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনের সমর্থনকারী অন্যতম রাজনৈতিক চক্র "নিয়মতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে গবেষণা সমিতি"র মুখপাত্র ছিল) পত্রিকাতে লিখেছিলেন যে, "সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করার জন্য তোমার বাম হাত তোল আর সাম্যবাদী পার্টিকে নিপাত করার জন্য তোমার ডান হাত তোল"। এই কথাগুলি এই শ্রেণীর উভয়সংকট ও উদ্বেগের একটি পরিষ্কার চিত্র উপস্থিত করে। এই শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদ অনুসারে গণ জাতীয় পার্টি কর্তৃক জনগণের জীবিকার নীতির ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায়, রাশিয়ার সঙ্গে গণ জাতীয় পার্টির মৈত্রী আর সাম্যবাদী ও বামপন্থীদের গণ জাতীয় পার্টিতে অন্তর্ভুক্তিরও *(টীকাঃ ১৯২৩ সালে চীনা সাম্যবাদী পার্টির সাহায্যে ডঃ সান ইয়াতসেন গণ জাতীয় পার্টি পুনর্গঠন করার, গণ জাতীয় পার্টি ও সাম্যবাদী পার্টির সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার আর সাম্যবাদীদের গণ জাতীয় পার্টিতে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি কুয়াংচৌয়ে গণ জাতীয় পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহবান করেন এবং রাশিয়ার সাথে মৈত্রী, সাম্যবাদী পার্টির সাথে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি সহায়তা করা, এই তিনটি মহান কর্মনীতি নির্ধারণ করেন। সেই সময় কমরেড মাও সেতুঙ এবং লি তাচাও, লিন পোচু, চু চিউপাই ও অন্যান্য কমরেড ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং গণ জাতীয় পার্টিকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময়ে গণ জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য এবং কেউ কেউ বিকল্প সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন)* বিরোধিতা করে। কিন্তু জাতীয় বুর্শোয়াদের শাসনাধীনে রাষ্ট্র গঠনের জন্য এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা একেবারেই অকার্যকর, কারণ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুইটি প্রধান শক্তি অর্থাৎ বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তি চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত। এই দুটি প্রধান শক্তি দুটি বিরাট পতাকা উত্তোলন করে রয়েছে, একটি হল বিপ্লবের লাল পতাকা যা তৃতীয় আন্তর্জাতিক ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর মিলনস্থল হিসেবে। অপরটি হল প্রতিবিপ্লবী শ্বেত পতাকা

জাতিসংঘ ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে বিশ্বের সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদের মিলনস্থল হিসেবে। মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো দ্রুত বিভক্ত হতে বাধ্য। তাদের কিছু বামে যাবে বিপ্লবে যোগ দেয়ার জন্য, অন্যরা ডানে গিয়ে প্রতিবিপ্লবে যোগ দেবে। তাদের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং চীনের মাঝারি বুর্শোয়া শ্রেণী যে "স্বতন্ত্র" বিপ্লবের ধারণা পোষণ করে যাতে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করবে তা নিছক বিভ্রান্তি মাত্র।

ছোট বুর্শোয়া শ্রেণী। মালিক কৃষক *(টীকাঃ মালিক কৃষক বলতে কমরেড মাও সেতুঙ এখানে মাঝারি কৃষকদের বুঝিয়েছেন)*, মালিক হস্তশিল্পী, নিচের স্তরের বুদ্ধিজীবি— ছাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক, ছোটখাট সরকারী কর্মচারী, দপ্তরের কেরাণি, ছোট উকিল--, এবং ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আকারের ও শ্রেণীর চরিত্রের দিক দিয়ে এই শ্রেণীটি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবি রাখে। মালিক কৃষক ও মালিক হস্তশিল্পী উভয়েই ছোট উৎপাদনে নিযুক্ত। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত সবগুলি স্তরেরই অর্থনৈতিক অবস্থা একই ধরণের ছোট বুর্শোয়া হলেও তারা তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পড়ে তারা, যাদের কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ও শস্য আছে অর্থাৎ দৈহিক অথবা মানসিক শ্রম দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় বা উপার্জন করে। এই ধরণের ব্যক্তিরা ধনী হবার জন্য একান্ত উদ্গ্রীব, আর তারা মার্শাল চাও *(টীকাঃ "মার্শাল চাও" হচ্ছে চীনের লোককাহিনীতে বর্ণিত অর্থের দেবতা, তার পুরো নাম চাও কোংমিং)*-এর একান্ত অনুগত পুঁজারী। খুব বড় অর্থ জমানোর ব্যাপারে মোহ না থাকলেও তারা মাঝারি বুর্শোয়া স্তরে উন্নীত হতে সর্বদাই ইচ্ছুক। অল্প টাকাওয়ালারাও যে সম্মান পায়, তা দেখে তাদের মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরে। এই ধরণের লোক ভীরু, সরকারী অফিসারদের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিপ্লবের ভয়েও কিছু পরিমাণ ভীত। অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে তারা মাঝারি বুর্শোয়ার খুব কাছাকাছি বলে তারা মাঝারি বুর্শোয়াদের